ছক্কা

টুটুলকে দেখে বোঝার কোনো উপায় নেই যে সে আসলে একজন খাঁটি বিজ্ঞানী। তার বয়স দশ, দশ বছর বয়সে কেউ পুরোপুরি বিজ্ঞানী হতে পারে না, সে কারণে সেও পুরোপুরি বিজ্ঞানী হতে পারে নি। কিন্তু যেটুকু হয়েছে সেটা একেবারে খাঁটি—তার মাঝে কোনো ভেজাল নেই। বিজ্ঞানীদের যেরকম বড় বড় চশমা থাকে, মাথায় এলোমেলো চুল থাকে, ময়লা অগোছালো কাপড় থাকে টুটুলের সেগুলো কিছু নেই। তার চোখ খুব ভালো, ক্লাসে একেবারে পিছনের বেঞ্চে বসে ব্ল্যাকবোর্ড পড়তে পারে, মাথায় চুল পরিপাটি করে আঁচড়ে রাখে, পরিষ্কার জামাকাপড় পরে। শুধু তাই না, বিজ্ঞানীদের মতো তার হালকাপাতলা দুর্বল শরীর নয়। তার পেটা শরীর—টেনিস বল দিয়ে ক্রিকেট খেলার সময় প্রতিদিনই সে দুই-তিনটা বাউন্ডারি হাঁকিয়ে দেয়। বিজ্ঞানীদের মতো সে ঘরকুনো নয়—প্রতিদিন বিকালে সে হইচই করে দৌড়াদৌড়ি করে খেলে।

কিন্তু তবু যে সে বিজ্ঞানী তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তার ড্রয়ার বোঝাই বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি—নানাভাবে সে যোগাড় করেছে। চশমার কাচ, পুরোনো রেডিও থেকে বের করা ক্যাপাসিটর, কয়েল, রেজিস্টার, টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে কেনা থার্মোমিটার, মোটর খুলে নেয়া চুম্বক, ব্যাটারি, ইলেকট্রিক তার—এমন কিছু নেই যেটা সেখানে পাওয়া যাবে না। এই সব জিনিস আছে বলেই যে সে বিজ্ঞানী তা নয়, অনেক বাচ্চার ড্রয়ার খুললেই এ রকম জিনিস পাওয়া যায়। সে বিজ্ঞানী, কারণ সে এইসব জিনিস জুড়ে দিয়ে বিচিত্র সব নূতন জিনিস তৈরি করে। অনেক বাচ্চাই হয়তো বইপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে এ রকম তৈরি করতে পারে, কিন্তু তাদের সাথে টুটুলের একটা পার্থক্য রয়েছে, সে শুধু চোখ বন্ধ করে অন্ধের মতো জুড়ে দেয় না—কেন কয়েকটা ছোটখাটো সাধারণ জিনিস জুড়ে দিলে সেটা অন্য একটা অসাধারণ জিনিস হয়ে যায় ব্যাখ্যা করে দিতে পারে। কিন্তু এই ব্যাপারটাও তাকে খাঁটি বিজ্ঞানী করে নি, তাকে খাঁটি বিজ্ঞানী করেছে সম্পূর্ণ অন্য একটা জিনিস। সে বিজ্ঞানীদের মতো চিন্তা করে।

যেমন—যখন তার বড় ফুফুর পর পর দুইটা মেয়ে হল তখন মেজো চাচি বললেন, আজকাল সবার শুধু মেয়ে হচ্ছে।

টুটুলের আম্মা মাথা নেড়ে বললেন, ঠিকই বলেছ ভাবী, মনে নেই আমাদের শিউলির মেয়ে হল?

হ্যাঁ, কাজলের হল। লীনার হল।

তখন অন্য সবাই মাথা নেড়ে বলতে লাগল, চারদিকে শুধু মেয়ে আর মেয়ে। পৃথিবীতে এখন মেয়ের জন্ম হচ্ছে বেশি।

টুটুলের পক্ষে আর চুপ করে বসে থাকা সম্ভব হল না। সে বলল, পৃথিবীতে পাঁচ শ কোটি মানুষ। মাত্র পাঁচ-ছয় জনকে দেখে সেটা সম্পর্কে কোনো কথা বলা ঠিক না।

ছোট চাচা ইউনিভার্সিটিতে পড়েন বলে তার ধারণা তিনি পৃথিবীর সবকিছু জানেন, মুখ বাঁকা করে বললেন, তুই জানিস পৃথিবীতে ছেলে থেকে মেয়ের সংখ্যা বেশি?

টুটুল বলল, জানি। তার কারণ বাচ্চার যখন জন্ম হয় তখন ছোট মেয়েদের থেকে ছোট ছেলেরা হয় দুর্বল—তারা সহজে মারা যায়। তাছাড়া মেয়েদের আয়ু বেশি হয়। তাই পৃথিবীতে মেয়ের সংখ্যা বেশি। আসলে পৃথিবীতে সমান সমান ছেলে আর মেয়ের জন্ম হয়।

পুরো ব্যাপারটার এ রকম একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়ার পরও বড়রা বিন্দুমাত্র প্রভাবিত হল না। ছোট চাচা চোখ লাল করে টুটুলের দিকে তাকালেন, মেজো চাচি ভুরু কুঁচকে ফেললেন আর আম্মা ধমক দিয়ে বললেন, যা ভাগ এখান থেকে। সবসময় শুধু বড়দের কথার মাঝে নাক গলানো।

টুটুল ইচ্ছা করলেই বলতে পারত সে মোটেও বড়দের কথার মাঝে নাক গলাচ্ছে না—একটা অবৈজ্ঞানিক কথাকে পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে বিশ্লেষণ করছে। কিন্তু সে তার চেষ্টাও করল না—তার বিজ্ঞানী মন অনেক আগেই আবিষ্কার করেছে, বড়রা ছোটদের মানুষ হিসেবে গণ্য করে না, তাদের সাথে যুক্তিতর্ক করা সময় নষ্ট এবং বকা খাওয়ার ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছু না। সে সাথে সাথে ঘর থেকে সরে পড়ল।

তারপর যেমন ধরা যাক এক রাত্রে হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে ওঠার ব্যাপারটা। ঘুম থেকে জেগে উঠে টুটুল দেখে তার ঘরে চেয়ারে একজন মানুষ চুপচাপ বসে তার দিকে তাকিয়ে আছে। অন্য যে কেউ হলে চিৎকার করে একটা তুলকালাম কাণ্ড করে ফেলত, টুটুল কিন্তু করল না—সাথে সাথে চোখ বন্ধ করে ফেলে নিজেকে বলল, এটা ভূত নয়, কারণ পৃথিবীতে ভূত বলে কিছু নেই। নিশ্চয় আমি ভুল দেখেছি। খানিকক্ষণ পর চোখ খুলে তাকিয়ে দেখে ভুল নয়, সত্যি সত্যি একটা মানুষ চেয়ারে বসে তার দিকে তাকিয়ে আছে। টুটুল আবার চোখ বন্ধ করে ফেলল। একটা চিৎকার প্রায় দিয়েই ফেলছিল, কিন্তু অনেক কষ্ট করে নিজেকে থামিয়ে নিজেকে বোঝাল, এটা ভূত নয়, চোর হতে পারে—কিন্তু চোরেরা চেয়ারে বসে তার দিকে তাকিয়ে থাকবে কেন? তবু সে ব্যাপারটা পরীক্ষা করার জন্যে চোখ খুলে জিজ্ঞেস করল, কে?

মানুষটা কোনো উত্তর দিল না এবং চেয়ারে নড়লও না। টুটুল বিজ্ঞানী বলে তার বালিশের নিচে দুইটা চুম্বক, দশ গজ এনামেল কোটেড তার এবং ছোট একটা টর্চলাইট থাকে। সে টর্চলাইটটা বের করে জ্বালতেই চেয়ারে বসে থাকা মানুষটা চোখের পলকে

এলোমেলো করে রাখা একটা কম্বলে পাল্টে গেল! অন্ধকারে সাধারণ জিনিস যে কী অসাধারণ মনে হতে পারে সেটা টুটুল সেদিন নূতন করে আবিষ্কার করল।

এ রকম অসংখ্য উদাহরণ আছে, যেগুলো শুধুমাত্র একজন সত্যিকার বিজ্ঞানীর জীবনে ঘটতে পারে। এখন কেউ এই ঘটনাগুলোকে গুরুত্ব দিচ্ছে না, কিন্তু একদিন যখন সে একজন বড় বিজ্ঞানী হবেন তখন সবাই যে অনেক বড় গলায় গল্পগুলো বলাবলি করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

এই টুটুল একদিন সকালে খাবারের টেবিলে একটা ডিম নিয়ে এসে বলল, এই ডিমটাকে কে ভাঙতে পারবে?

খাবারের টেবিলে যারা ছিল তারা একটু অবাক হয়ে বলল, ডিম ভাঙা আবার এমন কী কঠিন ব্যাপার?

টুটুল রহস্যের ভঙ্গি করে বলল, ভাঙতে হবে আমি যেভাবে বলব সেভাবে।

টুটুলের বড় ভাই বাবুল ক্লাস টেনে পড়ে, সে মুখে একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করে বলল, সেটা কীভাবে?

ডিমের মাঝখানে এক হাত দিয়ে ধরে চাপ দিয়ে। কোথাও ঠোকা দেয়া যাবে না—

টেবিলে যারা ছিল তারা একে একে চেষ্টা করল, কিন্তু কেউই ভাঙতে পারল না। একটা ডিমকে দেখে মনে হয় ভাঙা কত সহজ, কিন্তু সেটা এ রকম শক্ত হবে কে জানত? টুটুলের বোন তানিয়া জিজ্ঞেস করল, ভাঙতে পারছি না কেন রে ডিমটা?

টুটুল মুখে একটা বিজয়ীর ভাব ফুটিয়ে বলল, ডিমের খোসা আসলে খুব শক্ত। এই জন্যে এটাকে কোথাও ঠোকা দিয়ে ভাঙতে হয়। তখন সমস্ত শক্তিটা একটা বিন্দু দিয়ে কাজ করে বলে বহুগুণ বেড়ে যায়। কিন্তু যদি—

এ রকম সময় ছোট চাচা এসে বললেন, কী হচ্ছে ওখানে?

তানিয়া বলল, একটা ডিম ভাঙতে পারছে না কেউ।

ছোট চাচা মুখে তাচ্ছিল্যের একটা ভঙ্গি করে বললেন, এত বড় বীরপুরুষ কেউ ডিম ভাঙতে পারছে না? কিসের ডিম এটা?

টুটুল বলল, মুরগির ডিম। হাত দিয়ে চেপে ভাঙতে হবে।

দেখি। ছোট চাচা হাত বাড়ালেন।

টুটুল ডিমটা এগিয়ে দেয়। ডিমের মাঝখানে হাত দিয়ে ধরে বললেন, এভাবে?

হ্যাঁ।

ছোট চাচা চাপ দিলেন এবং হঠাৎ কড়াৎ শব্দ করে ডিমটা ভেঙে গিয়ে ভেতরের সবকিছু ছিটকে বের হয়ে এল। টুটুল কাছেই ছিল, তার মুখে এবং শার্টে সেইসব পড়ে একেবারে মাখামাখি হয়ে গেল।

খাবার টেবিলে যারা ছিল এবং ছোট চাচা হা-হা করে হাসতে শুরু করে। অপ্রস্তুত টুটুল মুখ মুছতে মুছতে বলল, কেমন করে করলে?

ছোট চাচা তখনো হা-হা করে হাসছেন। টুটুল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার হাতের দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ উজ্জ্বল চোখে বলল, তোমার হাতে আংটি—

ছোট চাচা টুটুলের কথার বিশেষ গুরুত্ব দিলেন না। তখনো হাসতে লাগলেন। টুটুল

বলল, তোমার হাতে আংটি ছিল, আংটি থাকলে সেখানে শক্তিটা এক বিন্দুতে কাজ করে। সেই জন্যে ভেঙেছে—

কেউ টুটুলের কথায় কোনো গুরুত্ব দিল না। সে বলেছিল ডিমটা ভাঙতে পারবে না, কিন্তু তবু ভাঙা গেছে এবং তার থেকে বড় কথা সেটা টুটুলের মুখে গিয়ে লেগে তাকে অপ্রস্তুত করা গেছে—সবাই সেই আনন্দেই আত্মহারা। শুধু তাই না, আম্মা এসে একটা ডিম নষ্ট করার জন্যে আর শার্টটাকে নোংরা করার জন্যে টুটুলকে আচ্ছা করে বকে দিলেন।

অন্য যে কেউ হলে রাগে-দুঃখে বিজ্ঞানচর্চা ছেড়ে দিয়ে বিবাগী হয়ে যেত, কিন্তু টুটুল বিবাগী হল না। বরং আঙুলে আংটি থাকলে সেটা দিয়ে যে শক্তিটাকে এক বিন্দু দিয়ে প্রয়োগ করে ডিমটা ভাঙা যায় এই সত্যটা আবিষ্কার করে খুব খুশি হয়ে উঠল।

এর কয়দিন পরের কথা। হঠাৎ করে দেখা গেল টুটুল ঘরের মাঝখানে একটা ফুটবল এবং টেনিস বল নিয়ে কিছু একটা পরীক্ষা করছে। তানিয়া জিজ্ঞেস করল, কী করছিস টুটুল?

টুটুল একগাল হেসে বলল, একটা ফুটবলের উপর একটা টেনিস বল রেখে ছেড়ে দিলে দেখ কী মজা হয়!

কী হয়?

ফুটবলটা নিচে পড়ে যখন উল্টো দিকে আসে তখন টেনিস বলটাকে দেয় এক ধাক্কা—ঠিক যেন ক্রিকেট ব্যাটের মতো আর পাঁই করে টেনিস বল ছুটে যায় উপরে।

তানিয়া কৌতূহলী চোখে বলল, দেখি—

টুটুল সাবধানে ফুটবলের উপরে টেনিস বলটা রেখে উপর থেকে ছেড়ে দিল—দুটি বল একসাথে নিচে এসে পড়ল তারপর হঠাৎ ম্যাজিকের মতো টেনিস বলটা গুলির মতো উপরে ছুটে যায়, ছাদে ধাক্কা লেগে ছিটকে আসে নিচে—যেন বলটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে!

তানিয়া টুটুল থেকে এক ক্লাস উপরে পড়ে—টুটুলের কাছে কিছু জানতে চাইলে তার সম্মানহানি হয়, তবু সে জিজ্ঞেস করে ফেলল, কেমন করে হল বল দেখি—

টুটুল আবার তার বোনকে বোঝাতে শুরু করল। সে যেমন চট করে বিজ্ঞানের সবকিছু বুঝে ফেলে অন্যদের বেলায় সেটা সত্যি নয়, তার অনেকক্ষণ লাগল বোঝাতে।

ব্যাপারটা আরো কয়েকবার দেখানো হল এবং এক সময় ছোট চাচাও এসে তার সেই বিখ্যাত তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটিয়ে বললেন, কী হচ্ছে এখানে?

টুটুল ছোট চাচাকে ব্যাপারটা বোঝাল। ছোট চাচা মুখে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিটা ধরে রেখে বললেন, দেখা দেখি।

টুটুল সাবধানে টেনিস বলটা ফুটবলের উপরে রেখে দুটি ছেড়ে দিল। সম্ভবত টেনিস বলটা ঠিক জায়গায় রাখা হয় নি, গড়িয়ে একপাশে চলে এসেছিল, তাই যখন ফুটবলটা নিচে এসে পড়ল আর টেনিস বলটা গুলির মতো ছুটে এল, সেটা ছাদের দিকে না গিয়ে সেটা ছুটে এল টুটুলের মুখের দিকে। এত জোরে সেটা তার মুখে এসে লাগল যে টুটুল এক মুহূর্তের জন্যে চোখে অন্ধকার দেখে সাবধানে দেয়াল ধরে নিজেকে সামলে নিয়ে

কোনোমতে দাঁড়িয়ে রইল, মুখের মাঝে রক্তের নোনা স্বাদ পাচ্ছিল, ঠোঁট নিশ্চয়ই কেটে গেছে।

যখন টুটুল শেষ পর্যন্ত নিজেকে সামলে নিয়েছে তখন তাকিয়ে দেখে ছোট চাচা পেটে হাত দিয়ে খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসছেন। হাসতে হাসতে তার চোখে পানি এসে গেছে এবং তার দেখাদেখি অন্যেরাও হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। রাগে-দুঃখে টুটুলের চোখে পানি এসে গেল—টেনিস বলটা কেন এত জোরে ছুটে আসে বিজ্ঞানের এই চমৎকার কারসাজিটা কেউ একটুও উপভোগ করল না—উপভোগ করল তার ব্যথা পাওয়াটা!

এরপর বেশ কিছুদিন বিজ্ঞানের যাবতীয় গবেষণা টুটুল নিজের মাঝেই গোপন রাখল। এই বাসায় যখন কেউ তার গবেষণার অর্থ বুঝতে পারবে না, তাদের পেছনে সময় নষ্ট করে কী লাভ। সে এর মাঝে এফ. এম. ট্রান্সমিটার তৈরি করল, ব্যারোমিটার তৈরি করল এমন কি বাইনারি সংখ্যা যোগ করতে পারে এ রকম একটা কম্পিউটার তৈরি করে ফেলল। এই বাসায় কেউ সেটার গুরুত্ব বুঝতে পারবে না বলে কাউকে কিছু বলল না।

একদিন দুপুরবেলা টুটুল স্কুল থেকে বাসায় এসে দেখে ছোট চাচার ক্লাসের কয়েকজন মেয়ে বাসায় বেড়াতে এসেছে এবং ছোট চাচা খুব হইচই করে তাদের সাথে লুডু খেলছেন। কোনো বয়স্ক মানুষ যে লুডু খেলতে পারে টুটুল জিনিসটা বিশ্বাসই করতে পারে না। টুটুল হাতমুখ ধুয়ে জেলি দিয়ে এক টুকরো রুটি খেয়ে বাইরে বের হয়ে দেখে ছোট চাচা তখনো হইচই করে লুডু খেলছেন, তার ভাবভঙ্গি দেখে মেয়েগুলো হেসে গড়িয়ে পড়ছে, আর ছোট চাচা সেটা দেখে খুব মজা পাচ্ছেন। টুটুল শুনল ছোট চাচা বলছেন, তোমরা লুডু খেলতেই জান না। লুডু খেলার মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে ছয় মারা। ছয় মারার একটা নিয়ম আছে—খানিকক্ষণ ঝাঁকিয়ে পুট করে ঢেলে দিতে হয়। এমনভাবে ঢালবে যেন আড়াইবার উল্টে যায়—তাহলেই ছয়!

টুটুলের বিজ্ঞানী মন সাথে সাথে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ফেলল। অন্য কেউ হলে সে প্রতিবাদ করে ফেলত; কিন্তু ছোট চাচা হচ্ছেন এক নম্বর যন্ত্রণা, তাই সে কিছু বলল না। ঘর থেকে বের হয়ে যেতে যেতে শুনল, একটা মেয়ে ছোট চাচাকে আহ্লাদী গলায় বলছে, আমাকে একটু শিখিয়ে দাও না গো, কেমন করে ছয় মারে—

ছোট চাচা বললেন, এই নাও, শিখিয়ে দিই। এইভাবে ধরে ঝাঁকাও—

টুটুল আর পারল না। একটু এগিয়ে এসে বলল, ছয় মারার কোনো নিয়ম নেই।

টুটুলের কথা শুনে ছোট চাচা অসম্ভব বিরক্ত হলেন। মেয়েগুলো না থাকলে টুটুলের কান ধরে একটা ঝাঁকুনি দিতেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এখন সেটা করতে পারছিলেন না, রাগ চেপে বললেন, টুটুল! তোকে এখানে কে ডেকেছে?

টুটুল উদাস গলায় বলল, কেউ ডাকে নি, কিন্তু তুমি অবৈজ্ঞানিক কথা বলছ তাই তোমাকে ঠিক করে দিচ্ছি।

ছোট চাচা চোখ লাল করে বললেন, আমি অবৈজ্ঞানিক কথা বলছি?

হ্যাঁ।

আমি কী অবৈজ্ঞানিক কথা বলেছি?

তুমি ছয় মারার নিয়ম শেখাচ্ছ। ছয় মারার কোনো নিয়ম নেই। ছয়বার মারলে এমনিতেই একবার ছয় পড়ে।

ছোট চাচা থতমত খেয়ে কী বলবেন বুঝতে না পেরে রাগ রাগ মুখে বললেন, ছয়বার মারলে একবার ছয় পড়ে?

টুটুল মাথা নেড়ে বলল, শুদ্ধ করে যদি বলতে চাও তাহলে বলবে ছয়বার মারলে একবার ছয় পড়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি।

এইরকম সময় একটা মেয়ে হি-হি করে হেসে বলল, ওমা ছেলেটা কী কিউট! কী সুন্দর বড়দের মতো কথা বলে!

এটা শুনে ছোট চাচা আরো রেগে গেলেন। চাপা গলায় মেয়েটাকে বললেন, কিউট না ছাই! এর সাথে তো থাকতে হয় না তাই জান না—এ হচ্ছে এই বাসার মূর্তিমান যন্ত্রণা।

আরেকজন মেয়ে বলল, যন্ত্রণা কেন হবে? কী সুইট ছেলেটা! তোমার নেফ্যু?

ছোট চাচা কোনো উত্তর দিলেন না, রাগ রাগ চোখে টুটুলকে বললেন, তুই কী বলছিস? ছয়বার মারলে একবার ছয় পড়বে?

সম্ভাবনা আছে। যদি সত্যিই ব্যাপারটা পরীক্ষা করতে চাও তাহলে বেশিবার মারতে হবে।

কত বার?

যেমন মনে কর বারবার মারলে দুইবার ছয় পড়ার সম্ভাবনা। আঠারবার মারলে তিনবার, চব্বিশবার মারলে চারবার, তিরিশবার মারলে পাঁচবার।

ছোট চাচা হঠাৎ কেমন জানি রেগে উঠলেন, চোখ ছোট ছোট করে বললেন, ঠিক আছে আমি তিরিশবার মারব, তুই বলছিস তাহলে পাঁচবার ছয় পড়বে?

টুটুল একটু অবাক হয়ে ছোট চাচার দিকে তাকাল, বলল সম্ভাবনা খুব বেশি।

ছোট চাচা হঠাৎ রেগে উঠে বললেন, উকিলের মতো কথা বলিস না। পড়বে কি পড়বে না বল।

টুটুল বলল, ঠিক আছে যাও, পড়বে।

আর যদি না পড়ে?

তাহলে কী?

ছোট চাচা হিংস্র মুখে বললেন, তাহলে তোকে এমন পেঁদানি দেব যে জন্মের মতো বিজ্ঞানীগিরি ছুটে যাবে।

ঘরের পরিবেশটা হঠাৎ করে কেমন জানি অস্বস্তিকর হয়ে উঠল। মেয়েগুলো কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই ছোট চাচা ছক্কাটা ঢেলে দিয়ে গুনলেন এক। তারপর দ্বিতীয়বার ঢেলে বললেন, দুই। তৃতীয়বার ঢেলে বললেন তিন।

ছয়বারের মাঝে প্রথম ছয়টা ওঠার কথা ছিল, কিন্তু উঠল না। টুটুল অবশ্যি অবাক হল না। সম্ভাবনার কথা কেউ বলতে পারে না। প্রথম ছয়বারে একবারও না উঠে পরের দুইবারে পর পর দুইবার উঠে যেতে পারে। কিন্তু দেখা গেল বারবার ঢালার পরেও একবার ছয় পড়ল না। ছোট চাচার মুখে এবারে সূক্ষ্ম একটা হাসি খেলতে লাগল।

যখন আঠারবার মারার পরেও একটা ছয়ও পড়ল না তখন টুটুল অবাক হয়ে যায়। অন্য সময় হলে সে শুধু অবাক হত—এখন সে একটু একটু ভয় পেতে থাকে। ছোট চাচা

মানুষটা সুবিধের নয়—তাকে কীভাবে শাস্তি দেবেন কে জানে। বাইরের মেয়েদের সামনে অপমান না করে বসেন।

টুটুল একটু এগিয়ে এল—এর মাঝে কোনো হাতের চালাকি আছে কি না কে জানে। সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, তার মাঝে ছোট চাচা আবার মারলেন, একটা চার পড়ল। হাতের কোনো চালাকি নেই, সত্যিই চার পড়েছে। অবিশ্বাস্য ব্যাপার—আজকেই এ রকম একটা ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে? ছোট চাচা আবার মারলেন, একটা দুই পড়ল।

টুটুল খুব সাবধানে একটা নিশ্বাস ফেলল। তিরিশবারের মাঝে পাঁচবার ছয় পড়ার কথা ছিল। এর মাঝে বিশবার মারা হয়ে গেছে একবারও ছয় পড়ে নি। ছোট চাচার হাত থেকে রক্ষা পেতে গেলে পরের দশবারে পাঁচবার ছয় পড়তে হবে, তার সম্ভাবনা খুব কম। এ রকম ব্যাপার আজকেই তার সাথে ঘটল। দুঃখে টুটুলের চোখে পানি এসে যেতে চায়।

ছোট চাচা হঠাৎ করে বেশি রকম কথা বলতে শুরু করেন। টুটুলের দিকে তাকিয়ে বললেন, কী রে সাইন্টিস? তুই না বলেছিলি ছয়বারে একবার করে ছয় পড়ে? কোথায় গেল ছয়গুলো?

টুটুল কিছু বলল না, তার কিছু বলার নেই। ছোট চাচা আবার মারলেন, এবারেও ছয় নেই, একটা এক! ছোট চাচা জোরে জোরে হেসে উঠে টিটকারি মেরে বললেন, দ্যাখ দ্যাখ ছক্কাটা কী রকম অবৈজ্ঞানিক! যখন ছয় পড়ার কথা তখন পড়ছে কিনা এক! কী অন্যায়! কী ঘোরতর অন্যায়!

ছোট চাচার চেঁচামেচি শুনে অন্যেরাও ঘরে এসে হাজির হয়েছে, ছোট চাচা সগর্বে তাদের পুরো ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন। টুটুল বলেছে তিরিশবার মারলে মোট পাঁচবার ছয় পড়বে, কিন্তু পড়ছে না। তিনি তিরিশবার মারবেন তারপর টুটুলকে একটা 'পেঁদানি' দেবেন—পেঁদানি কথাটা বললেন খুব কুৎসিতভাবে। সবাই মনে হয় ব্যাপারটা উপভোগ করতে শুরু করেছে, গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়েছে লুডুর বোর্ড আর ছোট চাচাকে।

ছোট চাচা ছক্কাটাকে বার কয়েক ঝাঁকিয়ে আবার মারলেন, এবারেও ছক্কাটা বার কয়েক গড়িয়ে একটা তিন দেখিয়ে স্থির হল। ছোট চাচা জিব দিয়ে চুকচুক করে শব্দ করে বললেন, কী অন্যায়! কী ষড়যন্ত্র! বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে কী গভীর ষড়যন্ত্র!

টুটুল নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল। ছোট চাচা তার মাঝে আরো দুবার মেরেছেন। এর মাঝে একটা পাঁচ আরেকটা চার পড়েছে। প্রত্যেকবার ছক্কাটা স্থির হওয়ার সাথে সাথে ঘরের সবাই একটা আনন্দের ধ্বনি করে উঠছে। মনে হচ্ছে সবাই দেখতে চায় ছোট চাচা কেমন করে টুটুলকে পেঁদানি দেন।

ছোট চাচা অনেকক্ষণ ছক্কাটা ঝাঁকিয়ে অনেক রকম অঙ্গভঙ্গি করে সেটাকে বোর্ডের মাঝে মারলেন এবং একটা তিন বের হল। সেটা দেখে তিনি খুব দুঃখ পেয়েছেন সেরকম ভান করে ভাঙা গলায় ন্যাকামো করে বললেন, আহা রে! কোথায় গেলি আমার ছয়? আমাদের সাইন্টিসের সাথে এত বড় দাগাবাজি করলি তুই?

টুটুল কিছু বলল না। সে টের পাচ্ছে আস্তে আস্তে তার কান লাল হয়ে উঠছে। তানিয়া বলল, আর পাঁচবার বাকি।

ছোট চাচা বললেন, পাঁচবার আর পাঁচটি ছয়। তারপর ছক্কাটি ঝাঁকিয়ে নানারকম

অঙ্গভঙ্গি করে সেটাকে ঢাললেন এবং হঠাৎ করে সবাই চুপ করে গেল, শেষ পর্যন্ত একটা ছয় পড়েছে।

ছোট চাচা গম্ভীর হয়ে ছক্কাটা তুলে আবার মারলেন। মনে হল তার ইচ্ছে ছিল একটা ছয়ও যেন না পড়ে। কিন্তু এবারেও একটা ছয় পড়ল এবং হঠাৎ করে ঘরে এক ধরনের নীরবতা নেমে এল।

ছোট চাচা কোনোরকম শব্দ না করে ছক্কাটা তুলে অনেকক্ষণ ধরে ঝাঁকালেন, তারপর লম্বা করে গড়িয়ে দিলেন। ছক্কাটা যখন স্থির হল তখন দেখা গেল সেখানে আবার একটা ছয় বেরিয়েছে।

ছোট চাচার মুখের চেহারা কেমন যেন হিংস্র হয়ে ওঠে। তাকে দেখে মনে হতে থাকে কেউ যেন তাকে অপমান করে বসেছে। তিনি ছক্কাটা তুলে আবার ঢাললেন, আবারো ছয় বের হল এবং সাথে সাথে ঘরে একটা বিস্ময়ধ্বনি শোনা যায়। ছোট চাচার ক্লাসের একটা মেয়ে বলল, কী আশ্চর্য!

ছোট চাচা কোনো কথা বললেন না। তাকে কেমন জানি অসুস্থ দেখাতে থাকে। ছক্কাটা তুলে তিনি কেমন একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে সেটার দিকে তাকিয়ে থাকেন। মনে হতে থাকে তিনি ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারছেন না।

তার ক্লাসের মেয়েটি বলল, কী হল? মারছ না কেন?

হ্যাঁ মারছি। ছোট চাচা তবু ছক্কাটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

টুটুল ছোট চাচার দিকে তাকাল এবং হঠাৎ করে বুঝতে পারল এবারেও একটি ছয় পড়বে। কেউ সেটা ঠেকাতে পারবে না। ব্যাপারটি সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক—তবুও টুটুল ব্যাপারটিতে পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে গেল। সে দেখল ছোট চাচা কাঁপা হাতে ছক্কাটিকে নিয়ে এগিয়ে আসছেন—সেটাকে ঝাঁকালেন এবং গড়িয়ে দিলেন।

ছক্কাটি গড়াতে শুরু করেছে, এক্ষুনি সেটা স্থির হয়ে দাঁড়াবে—টুটুল যে মনেপ্রাণে একজন বিজ্ঞানী—সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক একটা ব্যাপার দেখার জন্যে নিশ্বাস বন্ধ করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।